রবীন্দ্রনাথ

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্র - মৃত্যুর তেরো বয়রের সময় - ব্যবধানে বুদ্ধদেব বসু দুটি কবিতা লিখেছিলেন। ১৯৪২-এ ছিল শোকস্তব্ধ একটি এলিজি - সনেট, সভ্যতার ঘোর দুর্দিনে স্মৃতিবিধুরতায় যেখানে এই মহান কবি সম্বোধিত হচ্ছেন 'প্রিয়তম বন্ধু' অভিধায়: 'এত দুঃখ, এত দুঃসহ ঘৃণা—/ এ-নরক সহিতে কি পারিতাম, হে বন্ধু, যদি না/ লিপ্ত হ'তো রক্তে মোর, বিদ্ধ হ'তো গূঢ় মর্মমূলে/ তোমার অক্ষয় মন্ত্র...'। আর ১৯৫৫ -র ফসল 'রবীন্দ্রনাথ', এ-ও এক চতুর্দশপদী, ঘনবদ্ধ স্তবকে নয়, সমিল ভাঙা স্তবকের নিরীক্ষায় :

তবু ছিলে প্রতিযোগিতায়
পরপারে, বিশ্রামে শুভ্রতাময়, যেন তুমি কখনো করোনি
চেষ্টা, কিংবা যে কলস গিয়েছে ভেসে, তুমি শুধু জল।
যা পেয়েছি দু-দণ্ড তোমার কাছে, নিঃশব্দে, কেবল

সন্ধ্যার নিবিড়তায় ব'সে থেকে, আজ তাকে নির্ঘুম যামিনী
জ্বেলে দেয় কূট গ্রন্থে ভাবনার পাণ্ডুর অনলে,
বাক্, অর্থ, সম্পর্কের হিংসুক দাঙ্গা শেষ হ'লে।

এই দুটি সনেট - সমবায়ের ছকে-বাঁধা সীমাবদ্ধতায় শ্রদ্ধার্পণ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব সম্ভবত উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ওই আলোকসামান্য প্রতিভার জন্য শুধুমাত্র ২৮টি ছত্র আদৌ পর্যাপ্ত নয়। এই - কটি পঙ্‌ক্তির প্রেক্ষিতে শুধু শোকাতুর সন্তপ্ত শূন্যতাবোধকেই বোধহয় ছোঁয়া যায়, ব্যক্তিক বিলাপকে অক্ষরায়িত করা যায় কেবল। হয়তো, তখনই তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়নের জন্য কবিতা নয়, গদ্যই জরুরি, অনেক ছড়ানো রচনায়, সারগর্ভ গদ্যে, মনস্ক প্রবন্ধে যাচাই করে নিতে হবে এই শিখরস্পর্শী প্রতিভাকে, আলোকিত করতে হবে তাঁর নানান দিক, মুগ্ধতাবোধকে অনুবাদ করতে হবে যোগ্যতম ভাষায়, প্রত্যাশিত ভাষ্যে। রবীন্দ্র - বিরোধিতা কোনও পর্বে তাঁর ছিল কি ছিল না, সে - খবর ইতিহাস রাখুক, আমরা যে রাখি না, তা-ও নয়; কিন্তু ওজন যে-দিকে বেশি আমাদের চোখ রাখতেই হয় সে-দিকে, আমাদের বুঝে নিতে হয় এই সত্য যে, একটার - পর - একটা তাঁর বিশিষ্ট ও চরিত্রবান গদ্যেই ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়িত মহত্ত্ব মুদ্রিত হয়েছে তাঁর রবীন্দ্রমগ্নতা, আমাদের কাছে বিরলতম প্রাপ্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে তাঁর যাবতীয় বিশ্লেষ ও বীক্ষণ।

১৯৪২ ও ৫৫ -র যে - কবিতাদুটির উল্লেখ করলাম সূচনায়, বলতে পারি, তারও একটা অগ্রিম ইশারা ছিল ১৯৪১ -এ, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবর্ষেই। না, কবিতা নয়, ছিল গদ্য, বুদ্ধদেবের স্বভাবজ - স্বতন্ত্র গদ্য — 'রবীন্দ্রনাথের শেষজীবন' —যে - গদ্যের হাত ধরে সে-দিন পাঠকবর্গ সাক্ষী ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রাক - মৃত্যকালীন কয়েকটি দিনের ধূসর পাণ্ডুলিপির। ওই-দুটি কবিতা বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বুদ্ধদেবের বাকি ইতিহাস সম্ভবত গদ্য - ইতিহাস, গদ্য - অঞ্জলির ইতিহাস। একদিকে মরণোন্মুখ কবি, অন্যদিকে জীবন্ত এক গদ্যকার, একদিকে জীবনীশক্তি - ফুরিয়ে - আসা এক সত্তা, অন্যদিকে পরবর্তী প্রজন্মের প্রাণবন্ত প্রত্যক্ষণ, একদিকে কোটি - কোটি - শব্দ-লিখে-আসা ক্লান্ত লেখনীর অতীত, অন্যদিকে আগামীর - জন্য - গচ্ছিত-রেখে - যাওয়া তাঁর এক প্রবক্তার অনিঃশে, মোহাচ্ছন্নতা। প্রবন্ধটিতে বুদ্ধদেবের এক - একটি উচ্চারিত বিবৃতির জন্য আমাদের অপেক্ষা কখন যেন অন্যমাত্রা অর্জন করে নেয়। আমরা জেনে নি, 'বয়স যত বেড়েছে রবীন্দ্রনাথ ততই সুন্দর হয়েছেন এ-কথা তাঁর বিভিন্ন বয়সের ছবি ধারাবাহিকভাবে দেখলেই বোঝা যাবে', 'এত কাজের সঙ্গে এত অবকাশকে তিনি কেমন করে মেলাতে পারলেন এ একটা রহস্য হ'য়ে রইল', 'বিধাতা মুক্তহস্তেই দিয়েছিলেন, এবার একে-একে ফিরিয়ে নিচ্ছেন', 'বধির বেঠোফোনের প্রলয়বিক্ষোভ তাঁর নেই। তিনি আত্মসমাহিত, কিন্তু উদাসীন নন। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চের দিকে তাঁর চোখ খোলা, বাইরের জগতে অন্যায়ের স্পর্ধা, সইতে পারেন না, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সবই যেন মেনে নিয়েছেন। আক্ষেপ নেই। নালিশ করেন না', কিংবা 'কোনো প্রশ্নেই তিনি নিরুত্তর নন, কোনো প্রসঙ্গেই অনিচ্ছুক নন। তিনি সর্বদাই প্রস্তুত', ইত্যাদি। এ-সব পর্যবেক্ষণ, আগেই বলেছি, ১৯৪১-এর, তখন কবির জীবনে যবনিকাপাত হয়নি। দিব্যদর্শী এক কবির সঙ্গে আর -এক কবির শেষ - দেখায়, শেষ কয়েকদিন দেখার টুকরো - টুকরো মন্তাজ, আর তা - থেকে - উঠে - আসা বিরল গভীর কিছু মন্তব্য। এর আট বছর পর, ১৯৪৯ -এ বুদ্ধদেবের অন্যতম উপন্যাস 'তিথিডোর', রবীন্দ্র - মৃত্যুর রেশ তখনও অটুট, অপরিমাণ, সতেজ উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে তাঁর অলক্ষ্য অগোচরিত উপস্থিতি, বিগতস্মৃতি হলেও ফিরে আসে ১৯৪১, যেন নতুন - এক বিধুরতা নিয়ে স্মৃতি হয় বাইশে শ্রাবণ, চোখের সামনে রবীন্দ্র - প্রয়াণের দিনটি মরমী ভাষায় অবিকল দৃশ্যায়নের সৌজন্যে শুধুই যে জেগে ওঠে তা-ই নয়, ঐতিহাসিক মূল্য নিয়ে মহার্ঘ বলেও বিবেছিত হয় আমাদের কাছে, আমাদের সাহিত্যের কাছে।

।।দুই।।

১৯৪৩-৪৪ -এ বুদ্ধদেব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচন করে নেন রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'। কবি হিসেবে যত বড়, যে - ঈর্ষণীয় উচ্চাঙ্গে অবস্থান তাঁর, ছোটগল্পকার হিসেবে যে তেমন মহৎ নন, এমন - একটি প্রচলিত ভ্রান্ত ও কুণ্ঠিত ধারণার আমূল সংস্কার করে লেখাটি শুরু করেন তিনি, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সদর্থক সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যান, এগিয়ে গিয়ে দুটি প্রত্যাশিত আস্থাব্যঞ্জক বক্তব্য দেখি তাঁর এইভাবে : 'সারা বাংলাদেশটাকে পাওয়া যায় এখানে। যে - বাংলাদেশ শুধু বাস্তব নয়, জীবন্ত, তারই হৃৎস্পন্দন এর পাতায় - পাতায় আমরা শুনতে পাই', এবং 'গল্পগুলি তৎকালীন বঙ্গসমাজের একেবারে হুবহু প্রতিলিপি, তবু ইতিহাসের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে।' প্রসঙ্গত এসেছে ক্ষুধিত পাষাণ, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, শাস্তি, নষ্টনীড়, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, শেষের রাত্রি, সম্পত্তি - সমর্পণ, এবং জীবিত ও মৃত - সম্বন্ধীয় অনুপুঙ্খ আলোচনা, সারগর্ভ অভিমত। সমীক্ষার দুটি মূল্যবান অংশে বুদ্ধদেব অসাধারণ নৈপুণ্যে আলোকপাত করেছেন 'গল্পগুচ্ছ'-র প্রযুক্ত বিশেষণ, উপমা, দীর্ঘ উপমার উপর। বিশেষ করে নতুন - এক বার্তা তিনি পৌঁছে দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ - চর্চিত বিশেষণ প্রয়োগরীতি সম্পর্কে, যা তাঁকে হেনরি জেমস -এর স্তূপীকৃত বিশেষণ - ব্যবহার কৌশলকারুকে মনে করিয়ে দেয়। উদাহরণত বলেছেন ছুটি গল্পে ফটিকের উদ্দেশে একটি - দুটি নয়, প্রয়োগ করা হয়েছে আটটি বিশেষণ, অথচ অতিরিক্ত মনে হয় না একটিকেও, অথবা পুনরুক্তির সামান্যতম আভাসও নেই কোনওটির মধ্যে। রাবীন্দ্রিক এই শৈলীস্বভাব পরবর্তিকালে বুদ্ধদেবের বাগ্‌বিধির উপরেই যে প্রভাবসম্পাতী ছিল, তা আমরা আবিষ্কার করে নিতে পারি।

।। তিন।।

১৯৫২ -এ 'কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' —আবারও দুটি বিকল্পহীন গদ্যদৃষ্টান্ত, যা একই বৈঠকে অবশ্যই নয়, কিন্তু একই বছরে রচিত, যেন অবশ্যম্ভাবী দুটি 'companion piece' দ্বৈতসমীক্ষা। কিন্তু, তাই কি? আসলে তা নয়— দুটির ভাবনাবীজে যে - বিষয় - ব্যবধান আছে, তা তো শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট। মিল এক জায়গায়ই : একমাত্র বুদ্ধদেবই স্বকীয় বাগ্‌বিধি নিয়ে, প্রখর সমালোচনাবোধ নিয়ে, ভঙ্গির অনুপম বুনটে লিখতে পারতেন এই - দুটি প্রবন্ধ। এত বিশ্লেষণ, এত অবলোকন, এত অপ্রত্যাশিত পরিবেশন — এ -সবও যেন সমগোত্রীয় সাযুজ্যে অম্লান হয়ে থাকে তাঁর বিবেচনার আলোয়। কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের সব উপন্যাস সম্পর্কেই যে তিনি মোহগ্রস্ত ছিলেন তা নয়, উচ্ছ্বাস - জ্ঞাপনেও সংযম ছিল প্রয়োজনমতো, সংযমে ছিল যুক্তির বিন্যাস, বাজিয়ে নেওয়ার মতো নিঃসংকোচ নির্ভীকতা। যেমন উপন্যাসে 'সাধু' ভাষার প্রয়োগকে নির্দ্বিধায় গ্রাহ্যতা দিতে পারেননি তিনি, যেমন মনঃপূত হয়নি তাঁর চোখের বালি-র উপসংহার, ঘরে - বাইরে -কে মনে হয়েছে অতিকথনে ভারাক্রান্ত, শেষের কবিতা-র গল্পাংশকে মনে হয়েছে দুর্বল, মনে হয়েছে চার অধ্যায় -এ কোথাও-কোথাও তিনি তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞতার চৌহদ্দি অতিক্রম করে চলে যাচ্ছেন অসঙ্গতভাবেই। আবার, এ-সব নির্মোহ মন্তব্য থেকে নিজেকে বিশ্লিষ্ট করে যখন তিনি বলতে চান, ''গল্পগুচ্ছ' আর তার যমজ বই 'ছিন্নপত্র' রবীন্দ্রনাথের গদ্য বইয়ের মধ্যে এই দুটির আমি নাম করব, যা অসংখ্যবার পড়েও পুরনো হয় না,' কিংবা 'কবি ছাড়া আর কারো হাতে 'শেষের কবিতা' সম্ভব ছিল না,' অথবা 'তাঁর উপন্যাস - মালার মধ্যমণি এই গ্রন্থ ('গোরা') উপন্যাস হিসেবে সবচেয়ে তৃপ্তিকর, গঠনশিল্পে নিটোল, চরিত্রসৃষ্টিতে উজ্জ্বল, কাহিনীর বিন্যাসেও নিবিড়, —এই একটি বই প'ড়ে ধারণা হয় যে অন্তত একজন মহাকবিকে ঔপন্যাসিকেরও উপাদান দিয়েছিন তার ভাগ্যবিধাতা' —তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি, সুযম ভারসাম্য বজায় রাখার দায়টা একজন সমালোচকের পক্ষে কতটা জরুরি, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের বিচার করতে গেলে তাঁকে কতটা স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হয়, মুগ্ধতার পাশাপাশি কতটা গুরুত্বশালী হয়ে ওঠে তাঁর মোহহীন, নৈর্ব্যক্তিক ও পক্ষপাতশূন্য অবস্থান। বুদ্ধদেব বসু সেই গোত্রের প্রাবন্ধিক, যাঁর বক্তব্য আমাদের কাছে কখনও দুরবগম্য হয়ে ওঠেনি, দুষ্প্রবেশ্য মনে হয়নি তাঁর কোনও মন্তব্য; যা - কিছু বলেছেন তিনি প্রত্যাশিত কর্তৃত্ব নিয়ে বলেছেন, আত্মবিশ্বাসের চূড়ান্ত নিদর্শন থেকে উঠে আসছে তাঁর রচনার প্রতিটি ছত্র, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্যের নির্মাণনৈপুণ্য। প্রাবন্ধিক যখন ব্যাখ্যাতা হয়ে ওঠেন, হয়ে ওঠেন ভাষ্যকার কিংবা আবিষ্কারক, তখন তাঁর স্থির সিদ্ধান্তগুলিই যে আমাদের কাছে মীমাংসিত সত্যের রূপ নেয়, বুদ্ধদেবের এ-সব প্রবন্ধ তারই নির্ধারক নজির।

'কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তেমন কবি নন, যাঁকে বেশ আরামে ব'সে ভোগ করা যায়; তাঁর প্রভাব উপদ্রবের মতো, তাতে শান্তিভঙ্গ ঘটে, খেই হারিয়ে ভেসে যাবার আশঙ্কা তার পদে - পদে। তিনি যে একজন খুব বড়ো কবি তা আমরা অনেক আগেই জেনে গিয়েছি, কিন্তু যে-কথা আজও আমরা ভালো করে জানি না— কিংবা বুঝি না— সে-কথা এই যে বাংলাদেশের পক্ষে বড্ড বেশি বড়ো তিনি, আমাদের মনের মাপজোকের মধ্যে কুলোয় না তাঁকে, আমাদের সহ্যশক্তির সীমা তিনি ছাড়িয়ে যান'— রবীন্দ্রপ্রতিভার জন্য এই সম্মানসূচক অভিবন্দনাই মুদ্রিত রাখছেন বুদ্ধদেব তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধটির প্রথম অধ্যায়ে। দ্বিতীয় পর্বে বেশ সচেতনতার সঙ্গেই নির্দয় তিনি, অকাট্য অথচ শালীন ভাষা-ভঙ্গিমায় তৎকালীন অন্তঃসারশূন্য কবিতাকে আক্রমণ করেছেন, বিশেষ করে তাঁর প্রতিবাদ মুখর হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছন্দোঘটিত ব্যায়াম' - নামক কবিতা- প্রয়াসের বিরুদ্ধে। হয়তো, সমীক্ষাসূত্রে একটু বেশিরকম কঠোরই মনে হয়েছে তাঁকে, তবু তাঁর সঙ্গত বিশ্লেষ ও ব্যাখ্যার কাছে নত না - হয়ে পারি না আমরা। তৃতীয় অধ্যায়ে এল রবীন্দ্রনাথের - মায়াজাল - ভেঙে - বেরিয়ে - আসা উত্তররৈবিক যুগের প্রথম মৌলিক কবি নজরুলের কবিকৃতি প্রসঙ্গ, এল বাংলাসাহিত্যের মোড়- ফিরিয়ে, ঘন্টা - বাজিয়ে - চলে- আসা 'কল্লোল' - গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টার কথা। স্তরে - স্তরান্তরে এগিয়ে যান বুদ্ধদেব, তাঁর প্রবন্ধকে পৌঁছে দেন চতুর্থ অধ্যায়ে, আর এই পরিণতিপর্বেই তিনি আরও প্রত্যয় জ্ঞাপন করেন, উত্তর - রবীন্দ্র সময়কালে কারও - কারও কবিতায় উচ্চারণ যে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হতে শুরু করলো, সে স্বাতন্ত্র্যঅর্জন খুব সুলভ ছিল না, রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বকে মান্যতা জানিয়েই পরিশ্রমসাপেক্ষে উপার্জন করতে হয়েছিল তাঁদের সেই স্বকীয়তা।

।। চার।।

১৯৬০ আর ১৯৬২ -তে যে-দুটি প্রবন্ধ— 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী' এবং 'রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি ও বাঙালি' — দুটিতেই নির্ধারিত হয়েছে আন্তর্জাতিক ভাবনার পটপ্রেক্ষায় তাঁর প্রতিভার অবস্থান ও গুরুত্ব। প্রথম প্রবন্ধের উদ্বোধনী ছত্রেই ছিল সুধীন্দ্রীয় অবলোকনের সঙ্গত এক উদ্ধৃতি : 'রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় প্রথম য়োরোপীয় সাহিত্য লেখেন।' ভাবনাবীজ হিসেবে এই অবিস্মরণীয় মন্তব্যই প্রসারিত হয়েছে লেখাটির সর্বাঙ্গে। 'প্রত্যক্ষ আহরণ ও গভীরতর প্রভাব' যে এক কথা নয়— এই বিবৃতির সূত্র ধরে রচনাটির প্রারম্ভিক পর্যায়ে বুদ্ধদেব কৌতূহলী হতে চেয়েছেন— কেমন ছিল য়োরোপীয় সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সন্ধিৎসা, তাঁর পাঠব্যাপ্তি, তাঁর অধ্যয়নের পরিধি? তাঁর উপন্যাসে, প্রবন্ধে, পত্রমালায় প্রসঙ্গত ঘটেছে ওয়ার্ডওয়ার্থ, শেলি, কিটস, টেনিসন কিংবা ডান, ব্রাউনিং, ইয়েটসের উল্লেখ, কিন্তু প্রশ্ন তুলেছেন বুদ্ধদেব — বোদলেয়ার, সুইনবার্ন ভেরলেন বা মালার্মে, রিলকে বা ভালেরি — কেউ তাঁর কৃপালাভে কৃতকার্য হলেন না কেন? কেনই বা উনিশ - শতকী রুশ - উপন্যাস, ফরাসি চিত্রকলা, জার্মান-সংগীত — পশ্চিমী সভ্যতার 'এই প্রোজ্জ্বল স্তম্ভগুলিকে' অম্লানভাবে উপেক্ষাই করে গেলেন তিনি? এই সীমাবদ্ধতার আঁচ থেকে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর কোনও নিবন্ধকার রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বকে অসম্মান জানানোর সুলভ সুযোগ খুঁজে নিতেন নিশ্চয়ই; ভুললে চলবে না, বুদ্ধদেব সেই গোত্রের আলোচক নন। তাঁর কাছে, তাঁর লেখনীর প্রতাপ ও পারঙ্গমতার কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক উচ্চাঙ্গের। প্রবন্ধটির উপসংহারপর্বে তিনি বরং রবীন্দ্রনাথের স্বোপার্জিত স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আত্মসহায় স্বনির্ভর প্রতিভার এক বিরল দিকের।

এই অধ্যায়ের বিবেচনাধীন দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি ও বাঙালি'-র সবচেয়ে জোরের জায়গাটা সম্ভবত প্রচ্ছন্ন ছিল দুটি অমোঘ বাক্যকে ঘিরে : 'যে- বিশ্ববোধ গ্যেটে আয়ত্ত করেছিলেন সচেতন ও সচেষ্টভাবে, তা ছিল রবীন্দ্রনাথের সজ্ঞাপ্রসূত; গ্যেটের পক্ষে যা বার্ধক্যের উপার্জন, তা রবীন্দ্রনাথে অযৌবন অবিচ্ছেদী।' বলতে পারি, আগের প্রবন্ধটিতে বুদ্ধদেব যেখানে ইতি টেনেছিলেন, যে-কথা দিয়ে শেষ করেছিলেন তাঁর রচনা, প্রায় যেখান থেকেই শুরু করেছেন তিনি এই দ্বিতীয় নিবেদন। উদ্‌ঘাটন করে নিচ্ছেন 'বিশ্বকবি' কথাটার মধ্যে নিহিত দু-রকম আলাদা অর্থের ইঙ্গিত। এই দুটি প্রবন্ধের সৌজন্যে কী অনায়াসে আমরা চিনে নিতে পারি তাঁর দেশকালাতীত সাহিত্যকীর্তিকে, আর সে-সত্যের প্রতিষ্ঠায় কী দুর্লভ প্রাপ্তি হিসেবে সম্পদ হিসেবে থেকে যায় বুদ্ধদেবের সহৃদর্শী, অননুকরণীয়, শ্রদ্ধেয় গদ্যশৈলীস্বভাব! রবীন্দ্র - প্রতিভার অভ্রান্ত মূল্যায়নে এই উচ্চাঙ্গের গদ্যকারের ভূমিকাটাই যে শেষ কথা হিসেবে উচ্চারিত হয় আমাদের কাছে এবং ইতিহাসের পাতায়, এ-বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহই আর তাকে না। পরবর্তী প্রজন্মের পাঠকচিত্তে।